স্মরণীয় যাঁরা

বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

যে পাতায় যিনি আছেন

✦	১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৯
✦	২. মধুসূদন দত্ত	১১
✦	৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩
✦	৪. কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৫
✦	৫. জগদীশচন্দ্র বসু	১৭
✦	৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯
✦	৭. নীলরতন সরকার	২১
✦	৮. বিবেকানন্দ	২৩
✦	৯. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	২৫
✦	১০. যোগীন্দ্রনাথ সরকার	২৭
✦	১১. চিত্তরঞ্জন দাশ	২৯
✦	১২. আচার্য যদুনাথ সরকার	৩১
✦	১৩. অরবিন্দ ঘোষ	৩৩
✦	১৪. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	৩৫
✦	১৫. সুনয়নী দেবী	৩৭
✦	১৬. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৩৯
✦	১৭. সরোজিনী নাইডু	৪১
✦	১৮. বাঘাযতীন	৪৩
✦	১৯. অনুরূপা দেবী	৪৫
✦	২০. নিরুপমা দেবী	৪৭
✦	২১. নন্দলাল বসু	৪৯
✦	২২. সুখলতা রাও	৫১
✦	২৩. যামিনী রায়	৫৩
✦	২৪. সুকুমার রায়	৫৫
✦	২৫. ক্ষুদিরাম বসু	৫৭
✦	২৬. সত্যেন্দ্রনাথ বসু	৫৯
✦	২৭. সুভাষচন্দ্র বসু	৬১
✦	২৮. নজরুল ইসলাম	৬২

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহগ্রামে অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০-র ২৬শে সেপ্টেম্বর। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা ভগবতী দেবী।

ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ন'বছরের মধ্যেই গ্রামের পাঠশালায় তাঁর পড়াশোনা সমাপ্ত হয়। তারপরই উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি পিতার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। পিতার সঙ্গে পায়ে হেঁটেই কলকাতায় আসেন বিদ্যাসাগর। সেই আসার পথে রাস্তার ধারের মাইলস্টোনগুলির ইংরেজি সংখ্যা দেখে তিনি তা শিখে ফেলেন।

কলকাতায় এসে অত্যন্ত অভাবের মধ্যে তাঁকে পড়াশোনা করতে হয়। এখানে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে গভীর তপস্যার মতো, ফলে ভয়ংকর দারিদ্র্যও তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের কাছে বাধা হতে পারে নি। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান। আর সেই বৃত্তির টাকা দান করেন সব গরিব ছাত্রদের। সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের কারণে সর্বোপরি অগাধ জ্ঞানলাভের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের অনুরোধে তিনি সেই কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে, ১৮৫০-এ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৮৫১-তে ঐ কলেজেরই প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন তিনি।

নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় সে-সময়ে স্থাপিত হয়েছে শতাধিক বালিকা বিদ্যালয়। মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন তিনিই। পরবর্তীকালে তা বিদ্যাসাগর কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করে।

আজকের আমাদের এই লেখা, পড়া সবকিছুর মূলেই তিনি। তাঁর 'বর্ণপরিচয়' দিয়েই আমাদের অক্ষরজ্ঞান লাভ। সহজ, সরল, বাংলা গদ্যে তিনি লেখেন 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থ।

তখনকার সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুপ্রথা উচ্ছেদে বিদ্যাসাগর প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৫৬-তে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবারণেও তাঁর বিশেষ অবদান কখনই ভোলার নয়।

অপরের দুঃখে সদাই কাতর এই মানুষটি দুঃস্থের সেবায় কত কী যে করেছেন তা লিখে শেষ করা যায় না। সে-কারণে 'দয়ারসাগর' তাঁর যথাযোগ্য উপাধি।

ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তায় তাঁর মতো বাঙালি কম জন্মেছেন। ১৮৯১-র ২৯শে জুলাই এই মহামানবের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

মধুসূদন দত্ত

মধুসূদন দত্তের জন্ম যশোরের সাগরদাঁড়িতে। ১৮২৪-এর ২৫শে জানুয়ারি। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত। মাতা জাহ্নবী দেবী। হিন্দু কলেজে পড়াকালেই নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৮৪৩-এর ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। মধুসূদন হন মাইকেল মধুসূদন। ফলে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করে তাঁকে বিশপস্ কলেজে ভর্তি হতে হয়। ১৮৪৮-এ মাদ্রাজে চলে আসেন তিনি। সেখানকার এক অনাথ বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন মধুসূদন। তারপর মাদ্রাজের বিখ্যাত দৈনিক 'Spectator'-এর সহঃ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ-সময় থেকেই মাদ্রাজের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁর ইংরেজিতে লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। এখানে বসেই ১৮৪৯-এ তিনি লেখেন 'The Captive Lady' ও 'Visions of the past' নামের গ্রন্থ দু'টি।

১৮৫৬-তে কলকাতায় ফিরে আসেন মধুসূদন। ১৮৬২-তে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদনাকর্মে যোগ দেন। ওই বছরেই ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যাত্রা করেন। ১৮৬৬-তে লন্ডনের গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। ১৮৬৭-তে পুনরায় স্বদেশে ফিরে আসেন ও কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন।

মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্যের নবযুগের স্রষ্টাই বলতে হয়। তাঁর রচিত অনন্যসাধারণ সব গ্রন্থাবলী বাংলার গর্ব। ভারতের গৌরব। ১৮৫৯-এ তিনি লেখেন 'শর্মিষ্ঠা'। ১৮৬০-এ 'পদ্মাবতী', 'তিলোত্তমা সম্ভবকাব্য' ও অনবদ্য দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। ১৮৬১-তে বিস্ময়কর সৃষ্টি 'মেঘনাদবধকাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা', 'কৃষ্ণকুমারী'। ১৮৬২-তে অভূতপূর্ব সৃষ্টি 'বীরাঙ্গনা'। ১৮৬৬-তে 'চতুর্দশপদী কবিতা' ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক তিনিই। সনেটও মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবর্তন করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, সুপণ্ডিত এই মানুষটি অসংখ্য ভাষাতেও (ইংরেজি, বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, তামিল ও তেলেগু) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

জীবনে তিনি অর্থ উপার্জন করেছেন প্রচুর। ব্যয় করেছেন তার থেকেও বেশি। ফলে শেষের দিকে চূড়ান্ত আর্থিক সঙ্কটে পড়তে হয় তাঁকে। অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী অস্থির মানুষটি যেন উল্কার মতো ছুটে বেড়িয়েছেন জীবনভোর। স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন যেন এক ঝড়ের পাখি। মহাধনী পিতার মহাধনী পুত্র 'নিজ কর্মফলে' কপর্দকহীন অবস্থায় অকালে মৃত্যুবরণ করলেন আলিপুরের এক সাধারণ হাসপাতালে ('প্রবাসে যথা মরে দুঃখে.......।') মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ১৮৭৩-এর ২৯শে জানুয়ারি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৮-এর ২৬শে জুন চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৮৪৪-এ বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৪৯-এ তিনি কাঁঠালপাড়ায় এসে হুগলি কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। বিশেষ শ্রুতিধর বঙ্কিম বিস্ময়কর মেধার জোরে, কয়েকবার বছরে, ডবল প্রমোশন পান স্কুলে। এর মধ্যে ১১ বছরের বালক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নারায়ণপুর গ্রামের ৫ বছরের এক সুন্দরী বালিকার বিবাহ হয় (১৮৪৯-এ)। ১০ বছর পর, ১৮৫৯-এ বঙ্কিমের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু ঘটে। পরের বছর, ১৮৬০-এ তিনি পুনরায় বিবাহ করেন হালিশহরের চৌধুরী পরিবারের কন্যা ১২ বছরের রাজলক্ষ্মী দেবীকে। অপুত্রক বঙ্কিম ছিলেন তিন কন্যার জনক।

ইতিমধ্যে ১৮৫৬-তে বঙ্কিম আইন পড়বার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৭-তে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম (১৮৫৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। সে-বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৯-এ বঙ্কিম প্রথম বিভাগে বি. এল. পাশ করেন।

পাশাপাশি আইন অধ্যয়ন শেষ করে ১৮৫৮-তে তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে শুরু করেন তাঁর চাকরি জীবন। ১৮৯১-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর দীর্ঘ ৩৩ বছরের চাকরি-জীবন শেষ করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বাংলার প্রথম সফল ঔপন্যাসিক ও অনন্যসাধারণ প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমাগত তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি-সম্ভার দিয়ে দেশবাসীকে মুগ্ধ করেন। সেই প্রেক্ষিতে এই বিশেষ প্রতিভাবান মানুষটির 'সাহিত্য-সম্রাট' উপাধি যথার্থই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৪। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) থেকে শুরু করে 'সীতারাম' (১৮৮৭) পর্যন্ত একের পর এক ১৪টি কালজয়ী উপন্যাস লিখেছেন তিনি। 'দুর্গেশনন্দিনী'রও আগে বঙ্কিম একটি ইংরাজি উপন্যাস (Rajmohan's Wife, 1864) লিখেছিলেন। তারও আগে ১৮৫৬-তে 'ললিতা', 'পুরাকালিক গল্প তথা মানস' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা দু'টি কাব্য একত্রে প্রকাশ পায়। মাত্র ১৪ বছর বয়সে সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'-এ (১৮৫২-র ২৫শে ফেব্রুয়ারি) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা (কবিতা) প্রকাশিত হয়।

এছাড়া 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকা সম্পাদনা ও সেই সূত্রে অসংখ্য কালোত্তীর্ণ প্রবন্ধ ও প্রবন্ধগ্রন্থ লিখে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়ে আছেন। ১৮৯৪-এর ৮ই এপ্রিল এই মহান স্রষ্টার মৃত্যু ঘটে।